অধ্যায়-১

রেলপথ ও রেলপথ জরিপের ইতিহাস
(The History of railway and railway surveys)

১.১ রেলপথের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (Describe a brief history of railways) ঃ

বিজ্ঞানের প্রতিটি কল্যাণধর্মী আবিষ্কারই মানবসভ্যতাকে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরের দিকে ধাবিত করে। সপ্তদশ শতাব্দীর গুত্তিলগ্নে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার আধুনিক সভ্যতাকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়। এ সময় ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ি চালিয়ে নেয়ার ক নতুনতর চিন্তার উদ্ভব হয়। জেমস্ ওয়াট কর্তৃক নির্মিত প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে সাধারণ সড়কের উপর দিয়েই গাড়ি লানো হয়। ফলত এ সময় ইঞ্জিন আবিষ্কার হলেও রেলপথের আবিষ্কার হয়নি। সত্যি বলতে কি, চাকার উপর নির্মিত যানবাহনে লামাল (ভার) স্থাপন করে তা কাঠের গুঁড়ির উপর দিয়ে ঘোড়া (জন্তু শক্তি) বা অন্য কোনো শক্তির সাহায্যে টেনে নেয়ার বাস্তব ম্ভাকারী অজ্ঞাত ব্যক্তিই রেলপথের আবিষ্কারক। বর্তমান রেলপথের প্রথম যাত্রা উক্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে হয়েছিল। সময় তিক্রান্তের সাথে সাথে কাঠের রেলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য এর উপর পৃষ্ঠে লোহার পাত লাগানো হতো। এ প্রাথমিক ধারণার উপর ত্তি করেই আজকের দিনের 'পাত স্থাপন' (Plate laying) করা হয়। 1789 সালে পাথরের ব্লকের উপর কাস্ট আয়রনের রেল স্থাপন রা হয়। 1804 ট্রেভিথিক (Trevithick) রেলপথের জন্য বাষ্পীয় লোকোমোটিভ ডিজাইনও নির্মাণ করেন এবং রেলপথের উপর য়ে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে প্রথম কৃতকার্যতা লাভ করেন। 1811 সালে ইঞ্জিনিয়ার মারে সাহেব কর্তৃক উদ্ভাবিত 'রক রেল' ও 'কগ ল' পেটেন্ট তাঁর নিয়োগ কর্তা মিডিলটন কয়লা খনির মালিক 'ব্লেঙ্কিনসপ' সাহেব কর্তৃক গৃহীত হয় এবং একটি ইঞ্জিন নির্মাণ করে ডিলটন হতে ডোভার পর্যন্ত সমতল ভূমিতে স্থাপিত রেলপথে ঘণ্টায় 4 (চার) মাইল বেগে একটি রেলগাড়িতে 1900 টন মালামাল নান্তর করতে সক্ষম হওয়ায় এ ব্যবস্থা ব্যাপক ব্যবহার উপযোগী বলে বহু বছর ধরে চালু থাকে।

1812 সালে চ্যাপম্যান নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার রেলপথের উপর পুরোপথে বিস্তৃত একটি শিকলের সাহায্যে গাড়ি টেনে নেয়ার শেষ ব্যবস্থা করেন। এতে খাঁজকাটা চাকার সাথে শিকলটি লাগানো থাকতো এবং খাঁজকাটা চাকাটি ঘুরিয়ে শিকলটি টেনে গাড়ি মনে আগাতো। এ সময় রেলপথ ও রেল ইঞ্জিনের উপর ব্যাপক পরীক্ষা কার্য চলতে থাকে। এ অবস্থায় উলিংডন কয়লা খনির াকেট সাহেব ও এর ইন্সপেক্টর হেডলি সাহেব 'কগ চাকা' বাদ দিয়ে অনেকটা আধুনিক রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো ইঞ্জিনের উপর াগত মোট ভারকে অনেকগুলি চাকার উপর ভাগ করে দিয়ে ইঞ্জিনটি নির্মাণ করেন। এটি 'গিয়ার বা র‍্যাক' ছাড়াই ৮/৯টি বগি টেনে তে পারতো। এ সময় তারা পাফিং বিলি ও উইলিয়াম ডিলি নামে দু'টি ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। এ ইঞ্জিন দু'টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে থেষ্ট কৃতকার্যতা লাভ করে বিধায় পরবর্তী পঞ্চাশ বছর কয়লার খনিতে এগুলোর ব্যবহার দেখা যায়। কয়লার খনিতে ব্যবহৃত ভিন্ন ইঞ্জিনের উন্নয়ন ও এতদ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ করে 1814 সালে কিলিং ওয়ার্থ কয়লা খনির জন্য জর্জ স্টিফেনশন হেব ব্লুচার নামক বাষ্পীয়যান নির্মাণ করেন। এটি ৮টি ওয়াগনে রাখা 30 টন মালামাল সমেত 1:450 খাড়া ঢালের রেলপথে ঘণ্টায় মাইল বেগে চলতে পারতো। বিগত সময়ের মধ্যে এটি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট এবং ক্র্যাংকের সাহায্যে চালিত প্রথম ইঞ্জিন। এরপর হতে লপথ ও রেল ইঞ্জিনের ক্রমাগত উন্নয়ন সাধিত হতে থাকে। 1821 সালের পূর্ব পর্যন্ত শুধুমাত্র কয়লা খনির মালিকদের কয়লা নেই বাষ্পীয় যান ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। 1821 সালে ইংল্যান্ডে পার্লামেন্ট কর্তৃক স্টকটন-ডালিংটন প্রস্তাবিত পাবলিক লসড়কের পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ার ফলে রেলপথের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং রেলপথে রেলগাড়ি নার জন্য প্রথমে জন্তু শক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু 1825 সালের 27 সেপ্টেম্বর স্টকটন-ডালিংটন রেলপথ স্টিফেনশন র্মিত বাষ্পীয় যান চালিয়ে উদ্বোধন করা হয় এবং এ বাষ্পীয় যানটির চালকও ছিলেন জর্জ স্টিফেনশন। এই এক লেইনের লপথটি 38 মাইল দীর্ঘ এবং স্থানে স্থানে পার্শ্ব লাইন যুক্ত ছিল। এ গাড়িটি 30টি বগিতে 90 টন মালামালসহ ঘণ্টায় 10 হতে 12 ইল বেগে এবং সুবিধাজনক স্থানে 15 মাইল বেগে পথ অতিক্রম করেছিল। এতে কোনো যাত্রী বহন করা হয় নি। কিন্তু ঐ বছরই) অক্টোবর হতে এক্সপেরিমেন্ট নামক কোচে দৈনিক 15 হতে 20 জন যাত্রী যাতায়াতের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এরপর লিভারপুল-ানচেস্টার রেলপথ চালু করা হয় এবং 1830 সালের 18 সেপ্টেম্বর জনসাধারণের জন্য এ লাইন খোলা হয়। এ লাইনের জন্যই থম গতিশীল বাষ্পীয় ইঞ্জিন 'রকেট' ব্যবহার করা হয়। এ ইঞ্জিনটি স্থিতিশীল ইঞ্জিন অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যক্ষম। এ ইঞ্জিনের র্মাতা জর্জ স্টিফেনশনকে কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ পুরস্কৃত করেন। গতিশীল ইঞ্জিন 'প্ল্যানেট' তৈরি হওয়ার পর এটি সাধারণ বহারের উপযোগী প্রমাণিত হওয়ায় এর ব্যাপক প্রসার ঘটে।

1844 সালে স্যার ম্যাকডোনাল্ড, ইঞ্জিনিয়ার স্টিফেনশনের কর্তৃত্বাধীন একটি বিলেতি কোম্পানিকে ভারতীয় উপমহাদেশে লকাতা এলাহাবাদ রেলপথ নির্মাণ ও চালুকরণের জন্য ডাকেন। 1849 সালে এ বিষয়ে ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেট এবং ইস্ট ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি ও গ্রেট ইস্টার্ন পেনিনস্যুলার রেলওয়ে কোম্পানির ডাইরেক্টরদের মধ্যে প্রথম চুক্তি সম্পাদিত হয়। 1850 লে লর্ড ডালহৌসির আমলে প্রথম চুক্তির কাজ শুরু হয়। চুক্তির আওতায় 99 বছরের জন্য জমির ইজারা বিনিয়োগকৃত মূলধনের দ দেওয়ার নিশ্চয়তা (5% হারে) এবং 25 বছর বা 50 বছর পর সরকার কর্তৃক কোম্পানির স্বত্ব ক্রয় করার ক্ষমতা স্বীয় অধিকারে খে নিশ্চয়তা দান প্রথা কার্যকর করে।

Scanned with CamScanner

1853 সালে গ্রেট ইস্টার্ন পেনিনস্যুলার রেলওয়ে এবং 1854 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে চালু করা হয়। 1850 সালের পর 1859 সাল পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে রেলপথ নির্মাণের জন্য বিলেতে বেশ কয়েকটি রেল কোম্পানি গঠন করে সিন্ধু-প রেলওয়ে, ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ন্যায় বড় বড় রেলপথ নির্মাণ ও চালু করা হয়।

1828 সালে ফ্রান্সে ঘোড়ার টানা রেলগাড়ি দিয়ে রেলপথ চালু করা হয়, তবে যাত্রী যাতায়াত 1832 সালে চালু করা হয়। ষ্ট ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ি চালু হয় 1842 সালে। 1833 সালে আমেরিকায় (মোহার্ক-হাডশন), 1934 সালে আয়ারল্যান্ডে, 1935 জার্মানি ও বেলজিয়ামে, 1838 সালে অস্ট্রিয়াতে, 1839 সালে ইটালি ও নেদারল্যান্ডে, 1847 সালে সুইজারল্যান্ড ও ডেন স্পেনে 1848 সালে, নরওয়ে এবং আফ্রিকায় 1854 সালে, সুইডেনে 1856 সালে, জাপানে 1872 সালে, চীনে 1875 সালে, 1877 সালে, 1888 সালে তুরস্কে প্রথম রেলপথ চালু করা হয়। ভারতে 1853 সালের 16 এপ্রিল প্রথম রেলপথ (বোম্বাই-থানা কি.মি.) চালু হয়।

1947 সালে দেশ বিভাগের সময় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় 2706 কিলোমিটার (87 কি.মি. ব্রডগেজ, 1800 কি.মি. গেজ, 31 কি.মি. ন্যারো গেজ) রেলপথ নিয়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে গঠিত হয়। 1971 সালে স্বাধীনতার পর সাবেক পাকিস্তান রেলওয়ের 2857 কি.মি. রেলপথ নিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ছিল 923 কি.মি. ব্রডগেজ, কি.মি. মিটার গেজ। 1998 সালে যমুনা সেতুর উপর দিয়ে টাঙ্গাইলের ভূয়াপুর পর্যন্ত রেলপথের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

১.২ রেলপথের বৈশিষ্ট্য (Mention the characteristics of railways) ঃ

রেলপথের বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) বিশ্বের সকল দেশেই রেলপথ বিদ্যমান।

(খ) রেলপথে পরিবহন ব্যয় অন্যান্য পথে পরিবহনের ব্যয়ের তুলনায় কম।

(গ) একই পরিমাণ ওজন স্থানান্তরে অন্যান্য পরিবহনের তুলনায় রেলপথে কম পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়।

(ঘ) রেলপথ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব্যবস্থাপনা; এতে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যাও অধিক এবং এ খাত হতে সন্তোষজনক মুনা পাওয়া যায়। কাজেই এ পথের ভবিষ্যৎ রুদ্ধ ভাবাও কষ্টকর।

(ঙ) রেলপথে চালিত গাড়ির দিক নিয়ন্ত্রণ সহজ, স্টিয়ারিং এর দরকার পড়ে না। মূলত, রেলগাড়ির চাকা রেললাইন হতে হওয়ার সুযোগ নেই।

(চ) বিস্তর মালামাল স্থানান্তরসহ সড়কপথ, নৌপথ, বিমানপথের তুলনায় রেলপথ অধিকতর উত্তম ও নিরাপদ।

(ছ) শহরের সড়কে যখন স্থানান্তরের জন্য অসংখ্য জনতা গিজ গিজ করে ঠিক সেই মুহূর্তে রেলগাড়ি একই সাথে বহুসং জনতাকে নিরাপদে, স্বল্প সময়ে, বিস্তর মালামালসহ স্থানান্তর/পরিবহন করতে পারে।

১.২.১ রেলপথের সুবিধা (Advantages of railways) ঃ

দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে জনগণ, দ্রব্যসামগ্রী, মালামালের পরিবহন ও স্থানান্তর করা ছাড়াও রেলপথ সামা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে।

(ক) সামাজিক সুবিধা ঃ

১। রেলপথে ভ্রমণ জনসাধারণের জন্য নিরাপদ ও সহজতর।

২। রেলপথ তীর্থস্থান, গুরুত্বপূর্ণ স্থান ইত্যাদিতে যাতায়াতের সুবিধা দান করে।

৩। রেলপথে ভ্রমণ কালে বা বিভিন্ন এলাকায় রেলপথে যাতায়াত কালে বিভিন্নাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের আ প্রদান হয় এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সখ্যতা গড়ে উঠে এবং নিজের সুবৃহৎ মহান দেশকে নিয়ে জনগণ গর্বিত হয়।

৪। রেলপথে বিভিন্নাঞ্চলের অধিবাসীদের ভ্রমণের ফলে পরস্পরের সামাজিক-সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয় এবং বি অঞ্চলের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে।

৫। রেলপথে ভ্রমণ কালে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন ধরনের মনোরম; চিত্তাকর্ষক, মনোহারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিদৃশ্য হয়, একাকিত্ব ও মানসিক বিষাদ দূর করে।

(খ) রাজনৈতিক সুবিধা ঃ

১। পুরো দেশব্যাপী রেলপথের উত্তম নেটওয়ার্ক থাকলে কেন্দ্রের শাসন অধিকতর সহজে কার্যকর করা যায়।

২। রেলপথ দেশের বিভিন্নাঞ্চলের মানুষকে মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদিতে একত্রিত হতে সহায়তা করে এবং জাতীয় ঐ ধারণা উন্নয়নে কার্যকর প্রভাব ফেলে।

৩। জরুরি অবস্থায়, যুদ্ধকালীন সময়ে সৈন্য, রসদ, যুদ্ধাস্ত্র, মালামাল ইত্যাদি দ্রুত স্থানান্তর/পরিবহনে রেলপথ কা ভূমিকা পালন করে।

৪। উন্নত জীবনযাপনের জন্য উপযোগী স্থান অনুসন্ধান ও পুনর্বাসনে রেলপথ সহায়তা করে।

Scanned with CamScanner

(গ) অর্থনৈতিক সুবিধা ঃ

১। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে দ্রুত ত্রাণসামগ্রী দুর্গত এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছাতে রেলপথ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২। রেলপথ কাঁচামাল শিল্পকারখানায় এবং শিল্পকারখানার উৎপাদিত সামগ্রী জনসাধারণের নিকট স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে পৌছায়, ফলত শিল্প উন্নয়ন সহজতর হয়।

৩। রেলপথ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয় ফলত দেশের বেকার সমস্যার উত্তরণে সহায়তা করে।

৪। রেলপথ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ভোগকারীদের নিকট দ্রুত পৌছে দেয়, তাই বাজারদর স্থিতিশীল থাকে।

৫। রেলপথ মালামাল ও দ্রব্যসামগ্রীর সহজ পরিবহণে সুযোগ দেয় বিধায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৬। রেলপথের ধারের বনায়ন বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করে, ফল, টিম্বার ও জ্বালানির চাহিদা পূরণ করে, অর্থের সাশ্রয় করে, পরিবেশের উন্নয়ন ঘটায়, জাতীয় অর্থনীতি মজবুত হয়।

৭। রেলপথে জনসাধারণের চলাচলের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রকারান্তরে শিল্পায়নে উন্নয়ন সাধন করে।

উপরোক্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলোর আলোকে সহজেই বলা যায়, যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় রেলপথের অধিক সম্প্রসারণ দেশের শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়নে তথা সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(ঘ) শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়ন সুবিধা ঃ

(i) রেলপথ দেশের অভ্যন্তর অঞ্চলে উৎপাদিত কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদি শহরাঞ্চলের ভোক্তাদের নিকট পৌছাতে এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য বন্দরে দ্রুত সময়ে পৌছাতে সাহায্য করে, ফলত দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন ঘটে।

(ii) রেলপথ শিল্পের কাঁচামাল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত শিল্পে পৌছাতে ও শিল্পে উৎপাদিত মালামাল, দ্রব্যসামগ্রী ভোক্তার নিকট এবং রপ্তানিযোগ্য উৎপাদিত সামগ্রী বন্দরে পৌছাতে সাহায্য করে। ফলত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

(iii) উত্তম রেল যোগাযোগ ও এর সম্প্রসারণে খনিজ, কৃষি, শিল্পপণ্যের সহজ স্থানান্তর ও সরবরাহের মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার খরচ কমায়, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখে। ফলত জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

(iv)নিরাপদ, সাশ্রয়ী, দ্রুত, যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলপথের সম্প্রসারণে অবহেলিত প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিল্প কলকারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠার সুযোগ পায়। ফলে অবহেলিত প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জমির মূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, বেকার সমস্যার সমাধান ঘটে এবং দেশের সকল অঞ্চলে অর্থনৈতিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের প্রসার ঘটে।

(v) দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উত্তম প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক স্থাপন, জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা অপরিহার্য। জরুরি অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধকালীন অবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রেল যোগাযোগ ও পরিবহন কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

তাই বলা হয়ে থাকে "কোন দেশের রেলপথের সম্প্রসারণই ঐ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নে সহায়ক"।

১.৩ জনপথের চেয়ে রেলপথের সুবিধাদি (Advantages of railways over highwyas) ঃ

প্রত্যেকটি পরিবহন মাধ্যমেরই অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমের চেয়ে বিশেষ কিছু সুনির্দিষ্ট সুবিধা রয়েছে। রেলপথের ক্ষেত্রেও অন্যান্য পরিবহনের (যেমন সড়ক-জনপথে পরিবহন, জলপথে পরিবহন, আকাশ পথে পরিবহন ইত্যাদি) চেয়ে কিছু বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান। এ সকল সুবিধার সুপরিকল্পিত, সময়োপযোগী, সঠিক, সুদক্ষ ও যথার্থ বাস্তবায়ন রেলপথের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এখানে জনপথের চেয়ে রেলপথের সুবিধাদি উদ্ধৃত করা হলো–

(i) **দুর্ঘটনার হার ঃ** জনপথের চেয়ে রেলপথে দুর্ঘটনার হার খুবই নগণ্য।

(ii) **চলাচলে দিক নিয়ন্ত্রিত ঃ** জনপথে চালিত যানবাহনের চেয়ে রেলপথে চালিত রেলগাড়ি চলাচলের দিক অত্যধিক সুনিয়ন্ত্রিত। বাস্তবতা হলো রেলগাড়ি চলাচলে স্টিয়ারিং-এর দরকার হয় না। মূলত রেলগাড়ির চাকার রেললাইন ব্যতীত মুক্তভাবে চলার সুযোগই নাই।

(iii) **বিস্তর যাত্রী পরিবহন ঃ** বড় শহরের গিজগিজ করা বিস্তর যাত্রীসমষ্টিকে সহজেই রেলপথ দ্রুত ও নিরাপদে গন্তব্যে পৌছাতে সক্ষম।

(iv) **ভারী মালামালসহ দূরবর্তী ভ্রমণ ঃ** বিস্তর ভারী মালামালসহ ভ্রমণে জনপথের চেয়ে রেলপথের ভ্রমণ উত্তম।

(v) **ন্যূনতম শক্তি ব্যয় ঃ** ভার পরিবহনের বিবেচনায় জনপথের চেয়ে রেলপথে কম শক্তির দরকার হয়।

(vi) **সাশ্রয়ী ঃ** জনপথ ও অন্যান্য পরিবহনের চেয়ে রেলপথে পরিবহন সাশ্রয়ী।

(vii) **ট্যাকটিভ রেজিস্ট্যান্স ঃ** জনপথের চেয়ে রেলপথে ট্যাকটিভ রেজিস্ট্যান্সের পরিমাণ খুবই কম (১৫%–২০%)।

Scanned with CamScanner

(viii) **ভারী সমরাস্ত্র, সৈন্য ও রসদ পরিবহন ঃ** বিশেষ করে যুদ্ধকালীন সময়ে ভারী সমরাস্ত্র, সৈন্য, রসদ ইত্যাদি পরিবহনে জনপথের চেয়ে রেলপথ কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম।

(ix) **দুর্যোগে উপযোগী ঃ** বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দুর্যোগকালে ত্রাণসামগ্রী পরিবহনে জনপথের চেয়ে রেলপথ অধিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

(x) **গণবিপর্যয়ে ভূমিকা ঃ** হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি গণবিপর্যয়ে জনপথ বিপর্যয়ে পতিত হলে রেলপথ বিকল্প হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(xi) **যানজটমুক্ত ঃ** জনপথে একই সড়কে বিভিন্ন ধরন, শ্রেণি ও গতিবেগের (যেমন– বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল ইত্যাদি) অনেক সংখ্যক যানবাহন চলাচল করার ফলে অসহনীয় যানজট সৃষ্টি হয়। সুতরাং রেলপথে এক লেইনে একটির পর একটি রেলগাড়ি চলাচল করে বিধায় এটি যানজটমুক্ত।

(xii) **রাইট অব ওয়ে ঃ** জনপথের চেয়ে রেলপথে কম প্রশস্ত 'রাইট অব ওয়ে' এর দরকার হয়। এতে ভূমি হুকুম দখলে ব্যয় ভূমি মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

(xiii) **জনসমাবেশ ঃ** ধর্মীয় উৎসব, মিছিল-সভা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনসমাবেশের আয়োজনে একত্রে বহুসংখ্যক যাত্রী পরিবহনে জনপথের চেয়ে রেলপথ অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

(xiv) **কর্মসংস্থান ঃ** বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই রেলপথ থাকায় পুরো বিশ্বের রেলপথের সকল জনবল বিশ্বের যে-কোনো কোম্পানি বা আন্তর্জাতিক যে-কোনো সংস্থায় নিয়োজিত জনবলের তুলনায় অধিক এবং এতে বিনিয়োগকৃত মূলধন লভ্যাংশের হারও সন্তোষজনক।

১.৪ সড়ক পথ ও রেল পথের মধ্যে তুলনা (Comparison between roadways & railways) ঃ

নিচের ছকে সড়কপথ ও রেলপথের মধ্যে তুলনা করা হলো–

তুলনার বিষয়	সড়কপথ	রেলপথ
১। সড়কের পৃষ্ঠ	১। পৃষ্ঠ সমতল।	১। মাটির সড়ক পৃষ্ঠের উপর স্থাপিত স্লিপারের উপর লোহার রেল বসানো পৃষ্ঠ।
২। চলাচলকারী যানবাহন	২। বাস, ট্রাক, কার, জন্তু চালিত গাড়ি ইত্যাদি।	২। শুধুমাত্র রেলগাড়ি।
৩। চাকা চলাচলে ব্যবহৃত স্থান	৩। ক্যারেজ ওয়ে বা পেভমেন্টের সকল অংশ।	৩। শুধুমাত্র রেলপৃষ্ঠ।
৪। সাবগ্রেডে আগত ভার	৪। যানবাহনের ভার পেভমেন্টের মাধ্যমে সারগ্রেডে পৌঁছে।	৪। গাড়ির ভার স্লিপারের মাধ্যমে ব্যালাস্টের স্তর হয়ে মাটিতে পৌঁছে।
৫। প্রতি লেনে একই সময়ে চলাচলকারী গাড়ির সংখ্যা	৫। দু' স্টেশনের মাঝে বেশ কিছু সংখ্যক গাড়ি।	৫। শুধুমাত্র একটি গাড়ি।
৬। যাত্রী ও মালামাল উঠানামা	৬। সড়কের যে-কোনো ঈপ্সিত স্থানে।	৬। শুধুমাত্র স্টেশনে।
৭। সমকাজের জন্য ট্রাকটিভ ফোর্স	৭। রেলপথের তুলনায় অধিক।	৭। সড়কপথের তুলনায় কম।
৮। পরিবহনের খরচ	৮। রেলপথের তুলনায় অধিক।	৮। সড়কপথের তুলনায় কম।
৯। ব্যবহারকারী ক যানবাহনের চাকা	৯। রবারের চাকা।	৯। লোহার চাকা।
১০। পৃষ্ঠে ঘর্ষণ সহগ	১০। রেলের তুলনায় অধিক।	১০। সড়কপথের তুলনায় কম।
১১। নির্মাণকারী	১১। সরকারি বা স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্মিত।	১১। সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত।
১২। দুর্ঘটনার হার	১২। রেলপথের তুলনায় অধিক।	১২। সড়কপথের তুলনায় কম।

Scanned with CamScanner

তুলনার বিষয়	সড়কপথ	রেলপথ
১৩। চলাচলকারী যানবাহনের মালিকানা	১৩। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ও সরকার।	১৩। শুধুমাত্র কোম্পানি বা সরকার।
১৪। নির্মাণ ও মেরামত ব্যয়	১৪। রেলপথের তুলনায় কম।	১৪। সড়কপথের তুলনায় অধিক।
১৫। পাহাড়ি এলাকার ক্ষেত্রে	১৫। উপযোগী।	১৫। অনুপযোগী।
১৬। রাইট অব ওয়ে এর প্রস্থ	১৬। অধিক।	১৬। কম।
১৭। মেরামত	১৭। নির্দিষ্ট সময় পর পর।	১৭। সার্বক্ষণিক (প্রয়োজনের সাথে সাথে)।
১৮। মালামাল পরিবহন ক্ষমতা	১৮। সীমিত।	১৮। অত্যধিক ভারী মালামাল বহনে সক্ষম।
১৯। ঢাল	১৯। ক্ষেত্রবিশেষে অধিক খাড়া ঢাল দেয়া যায়।	১৯। ন্যূনতম খাড়া ঢাল দেয়া যেতে পারে।
২০। গমনাগমন	২০। সকলের জন্য মুক্ত।	২০। সকলের জন্য মুক্ত নয়।
২১। অশ্বশক্তির প্রয়োজন	২১। অধিক।	২১। কম।
২২। পরিবহনের দূরত্ব	২২। কম।	২২। বেশি।
২৩। পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ	২৩। সুদৃঢ় কোন নিয়ন্ত্রণমুক্ত।	২৩। নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক (সিগন্যাল, ইন্টারলকিং ইত্যাদি)।
২৪। চাকুরির সুযোগ ও সংখ্যা	২৪। অধিক।	২৪। কম।

১.৫ রেলপথ জরিপের উদ্দেশ্য (Mention the objectives of railway surveys) ঃ

নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য উত্তম ও সন্তোষজনক পথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে–

(ক) পরিদর্শন জরিপ (Reconnaissance survey)

(খ) প্রাথমিক জরিপ (Preliminary survey) ও

(গ) অবস্থান জরিপ (Location survey) করা হয়ে থাকে। নিম্নে এগুলোর উদ্দেশ্যগুলো উদ্ধৃত করা হলো ঃ

পরিদর্শন জরিপ ঃ রেললাইন বসানোর উদ্দেশ্যে পূর্বে যে অঞ্চলের জরিপ কাজ করা হয়নি, ঐ অঞ্চলের জন্য প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপের নামই পরিদর্শন জরিপ। এ জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো–

(i) জরিপতব্য অঞ্চল সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান পাওয়া ও

(ii) জরিপতব্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ও প্রধান অঙ্গগুলো সম্পর্কে তথ্যাদি নেয়া।

পরিদর্শন জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি–

(i) এবনি লেভেল (ঢাল কোণ নির্ণয়ের জন্য)

(ii) প্রিজমেটিক কম্পাস (দিক নির্ণয়)

(iii) অ্যানারয়েড ব্যারোমিটার (এলিভেশন জানার জন্য)

(iv) পেডোমিটার (দূরত্ব জানার জন্য)।

প্রারম্ভিক বা প্রাথমিক জরিপ ঃ পরিদর্শন জরিপের উপর ভিত্তি করে মনোনীত বিভিন্ন পথসমূহের মধ্য হতে একটি পথকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের নিমিত্তে প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক জরিপ করা হয়। তাই এ জরিপ বেশ সূক্ষ্মতার সাথে করতে হয়। এ জরিপের উদ্দেশ্যগুলো হলো–

(i) পরিদর্শন জরিপের সুপারিশকৃত বিভিন্ন পথের মধ্য হতে সর্বাধিক উপযোগী ও সাশ্রয়ী পথ নির্বাচন করা;

(ii) সম্ভাব্য পথসমূহের মধ্য হতে রেলপথের জন্য একটি পথ নির্বাচনের জন্য এগুলোর বিশদ সূক্ষ্ম পরিমাপ, তথ্য পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা।

অবস্থান জরিপ ঃ ভূমিতে রেল পথের অবস্থান চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করার জন্য অবস্থান জরিপ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো–

(i) প্রাথমিক জরিপের প্রাপ্ত তথ্য হতে নির্বাচিত ও ভূমিতে স্থাপিত সর্বাধিক উপযোগী ও সাশ্রয়ী পথটির বিস্তারিত জরিপ করা ও

(ii) পথটির অবস্থান নকশায় চিহ্নিত করা ও সরজমিনে ভূমিতে সংস্থাপন করা।

Scanned with CamScanner